Vol. 35 | No. 2 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ দাশ : তাঁর কবিতাচিন্তা

Volume	35
Issue	2
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাসুদুজ্জামান
Published online	February 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i2.5
Pages	১১৩-১৪০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

জীবনানন্দ দাশ : তাঁর কবিতাচিন্তা

মাসুদুজ্জামান

> কবিতা সম্বন্ধে বড়, সত্যার্থী আলোচনা কবিদেরই করা উচিত–সৎ কবিদেরই নিজেদের অনুভূতি ও চিন্তার কবিতাত্মক প্রয়োগ থেকে তাদের খুলে নিয়ে অন্য প্রয়োগে–কবিতা সম্পর্কে আলোচনায়–মাঝে মাঝে নিয়োজিত করা দরকার।
>
> **জীবনানন্দ দাশ**

সমকালে ঈষৎ উপেক্ষিত, কিন্তু পরবর্তী সময়পর্বে অনিঃশেষ শৈল্পিক মহিমায় বাঙালি পাঠককুল যার কবিতার দ্বারা স্পৃষ্ট–আলোপৃথিবীর সন্ধান পেয়েছেন, তিনি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯–১৯৫৪)। আর ওই উপেক্ষাই, সম্ভবত, আত্মরচিত কবিতা সম্পর্কে বোঝাবার গরজে কাব্যতাত্ত্বিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে তাঁকে। প্রমথ চৌধুরীকেও আবার গদ্য রচয়িতা হিসেবে যে রবীন্দ্রনাথের 'এক পংক্তি ওপরে' স্থান দেন, সেও তো ওই প্রলোভনে: 'ধূসর পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হবে'। জীবনানন্দের লক্ষ্য ছিল না কবিতা ছাড়া অন্য কিছু রচনার, তাগিদ ছিল শুধু 'কবিতা লেখার, কবিতা ভালো করে লেখা হলো কিনা তারও তাগিদ'।[১] কিন্তু নিজের যুগটা 'ক্ষয়ে নিপতিত, হতাশ, কৃশ–সমালোচনায় অসুস্থতার ছাপ পড়েছে', 'অশিক্ষিত পটু ছায়া'য় বিবর্ণ; ফলে কবিতা সম্পর্কে কিছু 'আলোচনা'

লিখে 'কবিতাশরীর ও তার অন্তর সম্পর্কে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার একটা সূত্র পাঠককে ধরিয়ে দিতে চেষ্টা'[২] করেছেন তিনি। আর এরই প্রাণনায় রচনা করেছেন বেশ কিছু স্বগত প্রবন্ধ। আত্মগত উচ্চারণ ও ব্যক্তিক প্রস্বর-ভাবনায় এতে উন্মোচিত হয়েছে আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়: কবি কে এই আরোপণ থেকে ব্রহ্ম অবধি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইতিহাস ও দর্শন, সময়হীনতা ও সাম্প্রতিকতা, আধুনিকতা ও ধ্রুপদ, ভাষা ও ইঙ্গিত এই সব বিভিন্ন প্রসঙ্গে সঞ্চরণ থেকে স্ফটিকায়িত হয়ে উঠেছে তার কবিতাচিন্তন। পাশ্চাত্যের কাছেও তাঁর ঋণ অপরিমেয়, যদিও পূর্বদেশীয় কাব্যভাবনার তত্ত্বতাৎপর্যের দিক থেকে তা পুনর্ণব, স্বীকরণ সূত্রে বিভাবিত।

গদ্যের ধরনেও জীবনানন্দ স্বচিহ্নিত, আত্মচিন্তনরাশির প্রবহমানতার দেশনা থেকে তাই তার রচনা স্বাধীন, অপ্রতিহত, প্রাতিভাসিক। তবে তথ্য, যুক্তি এবং সাহিত্যের দূরতর ও সাম্প্রতিক আলম্বন-বিস্তার, গহনতা ও ইঙ্গিতে তা পাঠকের ভাবনাকে উস্কে দিতে পেরেছে সহজেই। এ সবই অবিমিশ্র আপাতস্থির ও পরস্পরবিষমতার ভেতর দিয়ে পৌঁছে যায় ভাবনার তুরীয়লোকে। সংবেদন ও বৌধায়নের সুবাদে তখনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যবীক্ষণ। কোলরিজ প্রসঙ্গে, জীবনানন্দ যাকে বলেছিলেন 'বৃহৎ ধ্যানের ভিতরে মেধাবী সমাহিতি', তাই 'মর্মগ্রোথিত' হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যচিন্তনে।

অথচ জীবনানন্দের প্রবন্ধগ্রন্থ মাত্র একটি। সব মিলিয়ে পাওয়া গেছে ৫০টি প্রবন্ধের সন্ধান, যদিও সবগুলো আবিষ্কার করা যায় নি। কবিতা সম্পর্কে রচিত এইসব স্বগত লেখা ছাড়াও তাঁর কবিতাভাবনা ছড়িয়ে আছে নানাজনকে লেখা বেশ কিছু চিঠি, নিজের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা ও আত্মচরিতমূলক রচনায়।

২

জীবনানন্দ দাশ পাঠক ও সমালোচকের কাছে কবিতাকে, বিশেষত আধুনিক কবিতাকে সুসহ করবার গরজে গদ্য রচনায় বৃত হয়েছিলেন, এ তথ্য নিজেই ব্যক্ত করেছেন তিনি। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর রচনাবলি স্বগতকথন এবং আত্মনাট্যে বেজে উঠে ছুঁয়ে দিতে চেয়েছে পাঠকের মর্মতল।

কবি সম্পর্কিত প্রাথমিক বিবেচনা থেকে শুরু হয়েছে তাঁর শৈল্পিক এষণা। বীজমন্ত্রের মতো কবির চারিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর আদিতম রচনা '*কবিতার কথা*' শুরু করেছেন এইভাবে: 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি–কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য–বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়'।[৩] কবি কে, কেন কবি, কবির বৈশিষ্ট্য কি; সেই সঙ্গে কবির প্রসৃত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে উল্লেখ করলেন জীবনানন্দ দাশ। ব্যবহৃত তিনটি চাবিশব্দ এবং একটি বাক্যাংশের (parenthesis) পুনরাবৃত্ত উচ্চারণে নির্ণয় করলেন কবিচারিত্র। কবি ও কবিতার বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে 'কল্পনা', 'চিন্তা' ও 'অভিজ্ঞতা' এই শব্দকে বারবার অন্যান্য রচনাতেও ধ্রুবপদের মতো উল্লেখ করেছেন তিনি। 'কল্পনা' যে কবিতা সৃষ্টির সূচক জীবনানন্দ

এই ধারণাটি পেয়েছিলেন তার প্রিয় লেখক কোলরিজের কাছ থেকে। কান্টের বস্তুতেই সংস্থিত (thing-in itself) ভাবনাকে পুনর্বিন্যস্ত করে কোলরিজ কল্পনাকে 'প্রাণদ শক্তি' (vital force)[8] বলে জানিয়েছিলেন আমাদের।

কিন্তু কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এই ক্রমবিসারি ভাববন্ধের সংকেত জীবনানন্দ পেয়েছিলেন কোলরিজ এবং ইয়েট্স্ এই দু'জনের কাছ থেকে। কোলরিজ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে পেয়েছিলেন 'সুগভীর অনুভবের সঙ্গে অন্তর্লীন চিন্তনের সম্মিলন'[৫]; আর ইয়েট্স্ তো বলেই দিয়েছেন কল্পনাপ্রতিভা হচ্ছে 'জাতির নির্যাসবদ্ধ অভিজ্ঞতা'। [৬]

রোমান্টিক কবিদের দ্বারা বিভাবিত জীবনানন্দ কবির এইসব গুণপনার সঙ্গে সঙ্গে 'মহৎ কবি'র চারিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন—তার 'ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক (আশা করা যেতে পারে), অভিজ্ঞতা সজাগ ও চেতনা অবচেতনা ঐকান্তিকভাবে সক্রিয়'। ফলত, তার কাছে 'জীবনের উন্নতশীল ভাঙাগড়ার শুভ ও সার্থক আত্মনিয়োগ দাবী করা'[৭] যায়। আর এই একই অনুপ্রেরণায় জীবনানন্দ নিজেও কবিতাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন বলে জানিয়ে দেন আমাদের। তবে প্রতিভাবিবিক্ত কোনো লোকসাধারণ নন, স্বভাবপ্রতিভায় উদ্দীপ্ত ব্যক্তিমানুষই সাম্প্রতিক ও দূরতর কাল এবং সমাজের প্রেক্ষাপটে তার স্বভাবপ্রতিভাকে স্থির ও বিশুদ্ধ করে নিয়ে কবিতাচর্চা করবেন।[৮]

প্রমূল্যের এই চাপ থেকেই জীবনানন্দ কবির 'দৃষ্টিসাধনা'র[৯] প্রয়োজন আছে বলে ভেবেছেন। দৃষ্টিতে ও ধারণায় আরো বেশি

প্রবেশশক্তি ও শান্তি পেতে হলে অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞানের ব্যবহারও করতে হবে তাকে। কিন্তু 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি'[১০] নয় বিজ্ঞানচেতনার ক্রমপরিণতির ভেতর দিয়ে কবিদৃষ্টির উৎসারণ:

> জ্ঞান-বিজ্ঞানালয়ের প্রাচুর্য আজকাল অনেক। ওরা প্রত্যেকেই বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মালিক। কবি তা জানে। নিজেও সে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মেনেই চলে; না হলে সে কবি হিসেবে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু এ-বিজ্ঞান প্লাকার্ড-মারা বড় বড় সাইনবোর্ডে টানানো ফলিত বিজ্ঞানের নগরীর থেকে গৃহীত হয় না--এ বিজ্ঞানকে ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির গতি-পরিণতির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে স্থিত করতে হয়েছে কবিমানসের ভিতর; আমি বলছি কবিমানসের ভিতর; সাধারণ যুক্তিবাদী মনের ভিতরে উপরোক্ত গতি-পরিণতির ধারা স্থিরিকৃত হয় ক্রমপরিণতির জ্ঞানবিজ্ঞানে; সমর্থন পায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরীতির প্রচলনে; কিন্তু এই অন্যরূপ মানসের সম্পর্কে এসে তা হয়ে ওঠে কবিতা, সমর্থন পায় vision-এ উজ্জ্বল কবিদৃষ্টির উৎসারণে।[১১]

লক্ষ না করে উপায় নেই বিজ্ঞাননির্ভর, যুক্তিবাদী ক্রমান্বয়িক স্তরপরম্পরাকে ভেঙে দিয়ে কবিমানসের স্বতশ্চল গতিভঙ্গির অভিযাত্রাকে মেনে নিচ্ছেন কবি। কিন্তু প্রমূল্যের বোধ এরপরও হারিয়ে যায় না। সত্যসন্ধ, সৌন্দর্যজারিত অনির্বচ ভূস্পর্শমুদ্রায় কেঁপে ওঠে তার সৃজনীসত্তা। নীৎশের যুক্তিরহিত প্রকৃতি এবং কোলরিজ-হিউমের সজ্ঞা-সত্যেই (intuited truth) 'কবির সত্য' সমর্পিত: 'কবি কে? কবি তো সেই মানুষই যিনি সত্যকে অনুভব করতে পারেন এবং ভাষার আবেগ প্রদীপ্তির সাহায্যে আমাদের হৃদয়ের ভিতর পৌঁছিয়ে দিতে পারেন। অর্থাৎ কবির সত্য হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করলাম।

কিন্তু সেইজন্যই কবি সত্যপ্রচারক (মাত্র সমাজসংস্কারক) হলেন না। এবং কবির সত্যও সৌন্দর্যজারিত দাঁড়িয়ে রয়েছে সৌন্দর্যের হাত ধরে; সকাল বেলা। মাথার উপরে আকাশে অনেক উঁচুতে রৌদ্রের সাগরে যে অদৃশ্য পাখি গান করে মানুষের সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিয়ে যেন তেমনি সুন্দর সত্য; সেই নির্ঝর থেকেই ভেঙে-ভেঙে কবিতার অন্তরাত্মাও খুঁজছে নানা রকম নদী, সমুদ্র ও সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যেন।'[১২] 'অর্ধসিদ্ধ কবি' অবশ্য 'সমাজ ও জাতিকে জিইয়ে' তুলবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু কবির শরণসত্তা হচ্ছে 'মানববেদনার গূঢ় প্রকাশ'। আর এভাবেই তিনি নিজের 'চিত্তের আবেগেই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন'। তার এই আরোপণ থেকেই জীবনানন্দের ভাবনা এবার গড়িয়ে আসে কবিতার চারিত্রচর্চার অভিকেন্দ্রে। আর এক্ষেত্রে তিনি সর্বায়ত বোধিচর্যায় নিবিষ্ট।

'কবি কে'— জিজ্ঞাসার মতো 'কবিতা কী' এই উত্তরগর্ভ (rehtroric question) প্রশ্নের ব্যাখ্যা নানাভাবে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। কবিতার সাধ্যসীমা এবং প্রকৃতি এ দু'য়েরই সংশ্লেষ আছে তাঁর রচনাবলিতে । প্রথমেই স্মরণে আনতে পারি *শ্রেষ্ঠ কবিতার* ভূমিকায় প্রযুক্ত সেই ভাবনাবীজ: 'কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়'। আবারও সেই বর্গীকরণ, তবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে এবার চেতনার দ্বারা স্পৃষ্ট কবিতার ভাবনা। ভারতীয় রসবাদীদেরও মান্য করলেন তিনি। কিন্তু কবির প্রসঙ্গে ওই যে বলেছিলেন চিত্তের আবেগেই সৌন্দর্যসৃজন—তাঁর মতে কবিতায় এর দ্বিমাত্রিকতা আছে:

প্রথমত লোকোত্তর সৃষ্টি, সৌন্দর্যসৃষ্টি; দ্বিতীয়ত, হয়তো জীবন নিয়ে, যার

> মধ্যে গৌণত লুকিয়ে থাকে জীবনের প্রহেলিকা কিংবা তার আলোচনা, একটা অরুণ আভা, যার মূলে জীবনের সমস্যার গিঁট হয়তো শিথিল হয়ে আসে। রূপহীনা কেমন এক স্বর্গীয় পাখির ডানায় আবেগের মত এসে আমাদের নিয়ে যায় এমন এক আবহাওয়ায় যেখানে জীবনের দুঃখ ও সংগ্রাম, বিস্ময় ও আনন্দ, মানুষের হৃদয়ের ভিতরকার ঐ উচ্চ আকাশের মেঘের রঙ, সূর্যাস্ত, সন্ধ্যার জাফরান আলো ও নতুন জন্মে জারিত অন্ধকার এবং নতুন সূর্যের জ্যোতি সমস্তই আমাদের ধরা দেয়। আমাদের হৃদয় যেন স্তম্ভিত ও শুদ্ধ হয়ে থাকে—উচ্চতর স্তরে উঠে জীবনকে পর্যালোচনা করবার অস্ফুট চক্রাকার সিঁড়ির সন্ধান পায় যেন সে। শুধু ভবিষ্যতের ইমারতই নয়, একটা বর্তমান অত্যাশ্চর্য অননুভূতপূর্ব আস্বাদন ঘিরে থাকে তাকে; এবং কোনো-কোনো সময়ে সব জড়িয়ে একটা ব্যক্তির প্রশান্তি পায় সে, অন্য কোনো রকম নয়, কবির শিক্ষাদানের স্বরূপ এই রকম'।[১৩]

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তি প্রবাহের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে আছে সেই বহুবিদিত চিন্তনসূত্র, 'জীবনকে পর্যালোচনার' মসৃণ ভাষ্য। সেই সঙ্গে 'অত্যাশ্চর্য অননুভূতপূর্ব আস্বাদন'—এই সন্দীপনী উক্তিতে বোঝা যায় কবিতার ব্যাখ্যাবিশদীকরণে কী ধরনের নান্দনিকতা প্রশ্রয় পাচ্ছে তাঁর কাছে। তবে অমূর্ততার আবর্ত নয়, তিনি চেয়েছেন সমাজ ইতিহাস ও কালের প্রেক্ষাপটে কবিতার ঘনীভবন: 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'।[১৪] আর এইটেই হচ্ছে 'মানবতার ও কবিমানবের ঐতিহ্য'।[১৫] ইতিহাসের সূত্রে যে আমাদের বিশ্বভাবনা (Weltanschauung) তৈরি হয়, জানিয়েছিলেন ডিল্‌থে। আমাদের বিশ্বাত্মবোধ যা মানবিকতার সঙ্গে সংযুক্ত—তাও ইতিহাসকে এড়িয়ে গিয়ে তৈরি হতে পারে না: 'আমরা আমাদের নিজেদের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিকে এড়াতে পারিনা। আর যদিও আমাদের পরিসীমা থেকে

আরো দূরে ছড়ানো রয়েছে দিগন্ত; এটা কিছুতেই নিশ্চিত নয় যে আমরা আমাদের প্রয়োজন আর বিশ্বাত্মবোধ যা সমগ্র মানবতাকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে—খুঁজে পাবো'।[১৬] ডিলথের এই অনুচিন্তনই বিভাবিত করেছিল জীবনানন্দকে। সেই সঙ্গে এলিয়টের ইতিহাসচেতনার সমান্তর শিল্পভাবনায় জেগে উঠেছে জীবনানন্দীয় সংবেদ--কালজ্ঞানের সমতাময় অনুকৃতি এবং ঐতিহ্যের অনুষঙ্গ। জীবনানন্দ ব্যাখ্যাবিশদ করেন নি, কিন্তু সময়াবর্তনের পরস্পরসাপেক্ষতা সম্পর্কে সুবচন আছে এলিয়টেরও:

> This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional.'[১৭]

সময়চেতনা—জীবনানন্দ শুধু এলিয়টের কাছ থেকে নয়, এর প্রাণনা এসেছিল মূলত তার ভিত্তিদর্শন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগারের কাছ থেকে। হেগেলের সত্তা ও সময় (Being and Time) এবং কিয়ের্কেগার্ডের ভাবনাবাহিত হাইডেগার অস্তিত্বের (Existenz) কাঠামোর মধ্যে তিনটি প্রপঞ্চের যে উল্লেখ করেছেন তার সবগুলিই সময়চেতনার দ্বারা স্পৃষ্ট। তার ভাবনায় অস্তিত্ব ভবিষ্যপ্রসারী (refers to the future), অতীত ঘটনাসূত্রে বিজড়িত (facticity to the past) এবং বর্তমানে সমর্পিত (fallenness to the present)।[১৮]

কবিসাধারণ সংঘের দিক থেকে ইতিহাসচেতনার সূত্রপাত ম্যাথু আর্নল্ডের সময়পর্বে। লেসলি স্টিফেন একে দিয়েছেন 'মহাদেশীয় ইতিহাসবাদে'র (Continental Historicism) অভিজ্ঞান: 'ইতিহাস- পদ্ধতি এ মুহূর্তে তুঙ্গে, কেবল পুরোনো প্রবর্তনায় জীবিত সত্তার উন্নয়নের জন্য ইতিহাস নয়—দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক তত্ত্ব এবং অন্যান্য সব শাখার অনুসন্ধান জরুরি'।[১৯] এমনকি মিশেল ফুকোর সংগঠনবাদী (Structuralism) সামাজিক নন্দনচিন্তনে সঞ্চারিত হয়ে আছে যে ইতিহাসবোধ, জীবনানন্দ অনেক আগে একেই বলেছিলেন 'ইতিহাসবেদ'।[২০] ফুকোর মতোই ইতিহাসকে খণ্ডিত এবং প্রসারিত করে দেখতে চেয়েছেন।[২১] 'জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের এপিঠ ও ওপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে-মানবকে ফলিয়ে' তুলে তিনি সন্ধান করেছেন 'মনোমৈত্রী'র।[২২]

কবিতায় কল্পনার একাধিপত্য শুরুতেই উল্লেখ করেছিলেন জীবনানন্দ; এবার বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করতে গিয়ে বললেন তা পাঠকের 'কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে,'[২৩] 'পরিণামে প্রশান্তি'।[২৪] কিন্তু সমীপসময়ের এই 'বিচ্ছিন্ন যুগে শুদ্ধ কবিতার কি কোনো মানে'[২৫] আছে? আছে, এ সম্পর্কে জীবনানন্দীয় এই হলো অভিজ্ঞান: 'একটি ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনাপ্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা আছে'।[২৬] লক্ষণীয়, অভিজ্ঞতার এই বিশোধন শুধু নয়, 'প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে' তিনি কবিতার 'ভাবপ্রতিভাকে শুদ্ধ করে' চেয়েছেন 'জীবনদর্শন সৃষ্টি' করতে। জেনেছেন কবিতা হচ্ছে স্বার্থরহিত ব্রতকল্প: 'শ্রেষ্ঠ

কবিতা—অন্য যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পের মতো কবিমানসের আপন অভিজ্ঞতাকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে--নিঃস্বার্থ জিনিস'।[২৭] 'সৎ কবিতার স্পর্শে' এসে এভাবেই জীবনানন্দের 'নিহিত অভিজ্ঞতার একটা আশ্চর্য পুনরুত্থান'[২৮] ঘটছে: 'উপলব্ধি করতে পারা যায় করুণা বা অপ্রেম বা সঙ্কটের বলয়ের ভিতরে গিয়েছিলাম কিছুকাল আগে, পরে বেশি অনিমেষভাবে ব্যক্ত হল সব কিছু; উঁচু উঁচু গাছ দেখেছিলাম বাতাস, পাখি, কাছে কোথাও অনেকখানি জল ঝিকমিক করছে রোদে--অনেকদিন ভেবে দেখিনি সে সব কথা; কবিতাটি স্মারক আঙুলের মতো এসে আমার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাকে ডাক দিয়ে সচেতন করিয়ে দিল আবার। আবার বোধ করা গেল প্রত্যন্তের দেবদারু জল পাখি আকাশ এবং কী তাদের মর্মার্থ ব্যক্তি ও তার প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে; কিংবা পট আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়ে অনুভব করি কী তাদের সম্বন্ধ শ্রী লক্ষ্য মানুষ সংসার জীবন আচলমান মানবীয় বৃত্তান্তের ভিতর'।[২৯] অর্থাৎ কবিতার শক্তি রয়েছে পাঠককে 'আলোকিত' করবার। ফলত সময়ের ছাপ থেকে কবিতাকে মুক্ত থাকতে হয়। এমন কি 'বিশেষ সময়চিহ্নের ছাপ' এলিয়টের উপর 'জাজ্জ্বল্যমান' বলে তার কবিতা ফিকে হয়ে যেতে পারে--মনে হয়েছে জীবনানন্দের।

তাহলে, কবিতা কাকে বলবো? মহৎ কবিতা? জীবনানন্দ কবিতা সম্পর্কিত তার মূল চিন্তাদর্শটি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন কবিদের অভিজ্ঞতার রয়েছে দু'টো উৎসমুখ--একটি 'জীবনে' অন্যটি 'গ্রন্থসংস্কারে'। কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো 'পাণ্ডিত্য ঠিক নয়, জ্ঞানের সাহায্যে জীবনকে' বা 'ইতিহাসের বৃত্তান্তকাল ধরে নয়; এ হলো জীবনের সাহায্যে জ্ঞানময়তার উৎসারণ'। আর তাহলেই কবিতা পেতে

পারে মহত্ত্বের শিরোপা: 'মহৎ কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে নিবিড় নয় কেবল মাত্র; কিন্তু এই দুই জিনিস মিলে এক হয়ে গেছে সেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হতে পারে যে মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস; কিংবা জীবনকে কোনো আলাদা জগতে নিয়ে নতুন করে তাকে সৃষ্টি'।[৩০]

কবিতা ও কবিতার শিল্পসীমা বিস্তৃত করে তুলবার পর জীবনানন্দ আধুনিকতা নিয়েই ভেবেছেন সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমের আধুনিকবাদ, যার অভিঘাত এসে লাগে ভারতীয় মানস-তটভূমে, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে–সবারই অন্বিষ্ট ছিল এর গরিমাসন্ধান।

ভারতাত্মাকে ধারণ করে পশ্চিমের দ্বারা বিভাবিত যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথ তখন অপ্রতিম কবিগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। আধুনিকবাদীরা এরই বিপরীতে 'অভিমানী অহং'কে[৩১] শরণমন্ত্র ভেবে এগিয়ে এলেন কবিতা রচনার গরজে, অব্যবহিত সময়পর্বে যা আধুনিকবাদ (Modernism) বলে পেয়েছে বিশ্ববীক্ষা। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমণের অভিপ্রায় থেকেই তারা ছিলেন কাব্যচর্চায় অভিনিবিষ্ট, নতুনতর তাৎপর্য সন্ধানে বৃত। জীবনানন্দের মনে হয়েছে পূর্বাচার্যের 'কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাসচেতনা একটা নির্দিষ্ট সীমায় এসে'[৩২] মন্থর হয়ে গেছে। এখন চাই 'সৃষ্টিরহস্যের নতুনতর অর্থসন্ধান', 'অভিনবত্বের গরিমা'। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিকবাদের বিভাজনরেখা জীবনানন্দ টেনেছেন 'আদর্শগত বিসদৃশতার' সূত্র ধরে। তিনি বলেছেন 'ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশি'। এরই বিস্তারিত

ভাষ্য: 'আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার ছাপ এমন দেদীপ্যমান যে মুহূর্তের জন্যেও রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা বা গানের সংস্পর্শে এলে মনে হয় তার সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা কী ভয়াবহভাবে চমৎকার। আমাদের দিক থেকে এই বিষমানুপাতিক গতির প্রয়োজন ছিল বললেই চলবে না, বর্তমান সমাজ ও ইতিহাসের দিক দিয়ে এ বিষমতা দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে--কোনো মৃদুকম্পিত আধুনিকও তা এড়াতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।'[৩৩] জীবনানন্দীয় ভাবনার অন্তর্গহনে, বোঝা যায়, ইউরোপীয় চিন্তাচেতনাই ছিল আধুনিকতার 'আলোভূমি',[৩৪] পশ্চিমমনস্কার স্বীকরণসূত্রে তাই ভারতাত্মার উদ্বোধন চেয়েছেন তিনি। এভাবেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়ার সুবাদে আধুনিকতার বিভাবিত নান্দনিকতা। অর্থাৎ জীবনানন্দের আধুনিকতা হলো সেই নির্ণায়ক 'দৃষ্টিভঙ্গি' যাতে উৎকীর্ণ হয়ে আছে 'রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক প্রশান্তির বিরুদ্ধে সশ্রদ্ধ প্রতিবাদ'। রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দের একটি চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে এর:

> 'অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন--পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকেরা serenity জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। দান্তের Divine comedyর ভেতরে কিম্বা

শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না'।[৩৫]

মনোভঙ্গির এই পার্থক্য থেকেই রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে আধুনিকদের কখনো 'অজ্ঞাতসারে', কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর চেতনায় 'গভীরতর সংঘর্ষে আসতে হয়েছে'। 'সমাজ ও সভ্যতার শববাহনে' বিজড়িত হয়ে পড়েছেন তারা। আর এভবেই 'চলৎপ্রতিভাময়ী পটভূমির সঙ্গে একাত্ম' হয়ে উঠেছে তাদের রচনাবলি। আধুনিকতার অন্যতম শর্ত যুগসম্পৃক্ততা--এই অভিজ্ঞান ব্যক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবির কাছ থেকে দাবি করেছেন 'আধুনিক কালের আরো জটিল বিন্যাস'।[৩৬] এই বিন্যাসের ধরনটি হবে ভাবনার দিক থেকে বহুমাত্রিক, বিচিত্রতর। জীবনানন্দ সিরিনিটির বিপ্রতীপে আধুনিক মানুষকে এরই অনিবার্যতায় প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছেন 'নৈরাজ্যে', যদিও শেষ সংবেদনে তা অনুত্তীর্ণ থাকে নি। তবু তিনি আধুনিক কবিতায় দেখেছেন মানুষ 'বিভিন্ন অর্থ ও লক্ষ্যের চলাচল সত্ত্বেও অনেকখানি একক—কম বেশি স্থিত ও নিঃসময়'।[৩৭] মানবিক অভিচেতনায় তাই বেজে উঠেছে 'অন্তর্নিঃসহায়তা'র মন্ত্র:

> 'মানুষের প্রাণধর্মে টিকে থাকার_ মনকে চোখ ঠার দিয়ে বা না দিয়ে_ প্রাথমিক উপায় হিসেবে (নিজের অজ্ঞাতসারে প্রায়ই) হাজার বছর ধরে গ্রহণ করে আসছে মানুষ। কিয়েৰ্কেগার্ড প্রথম দার্শনিক তথ্য হিসেবে মানুষকে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বুঝি; শেক্সপীয়র-এর কথা ছেড়ে দিলেও গ্রীক নাটকের আদ্যোপান্ত ছেদ ও বিচ্ছেদের ধারণা ও প্রকাশের ভিতর, কিয়েৰ্কেগার্ড ও তাঁর সাহিত্যিক শিষ্যদের রীতির চেয়ে আরো নিপুণ ও নির্ভুল প্রয়োগে, মানুষের জীবনের এই অন্তর্নিঃসহায়তার কথা ফুটে উঠেছে'।[৩৮]

নিজের লেখা কবিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এই নিঃসহায়তার সর্বায়ত সুর সবার জীবনে ছড়িয়ে আছে বলে জীবনানন্দ উল্লেখ করেছেন। নিরবলম্ব মানবিক অস্তিত্বের প্রদর্শক কিয়েৰ্কেগার্ড—এই বিবেচনার পূর্বে পাসকালের চিন্তনের মধ্যেও পাওয়া যায় এই মানবিক অনিশ্চিতির পূর্বাভাস। হেগেলের পরমসত্তার (Absolute) শরণ নিলেই মানুষের মুক্তি ঘটে না—জানিয়ে দিয়ে কিয়েৰ্কেগার্ড তাকে আহ্বান জানালেন 'প্রত্যয়ের সঙ্গে প্যারাডক্সের পরিখা অতিক্রম করে যেতে'।[৩৯] প্রত্যয় ও পরিখা—এই দুই বৈপরীত্যের যুগ্মায়নই আধুনিকতা, জীবনানন্দের এই সংবেদ-বোধই এখানে স্পষ্ট। ফলত 'আধুনিক কবিতা' শিরোপাযুক্ত ওই নিবন্ধের অন্তিমে জীবনানন্দ বীজমন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন: 'শূন্য সন্ধান নয়—সামাজিক স্তরে মানুষের খুব সম্ভব ভবিষ্যৎ রয়েছে'।[৪০] গডফ্রিড বেন একেই বলেছেন 'সমন্বিত বিপ্রতীপ' (integrated ambivalence)[৪১], যার বৈশিষ্ট্য হলো বিপরীতের বিমিশ্রণ। হেস্, জয়েস, রিল্‌কে আধুনিক সব লেখকের রচনা এভাবেই মেরুময়তা (polarity) এবং দ্বৈততার (dualism) যুগ্মায়নে[৪২] গ্রথিত। বিপরীতের সংশ্লেষে জীবনানন্দের কাব্যচিন্তনও পরিশ্রুত। প্রতিধারণার এই বোধ থেকে তিনি তাই সহজেই পৌঁছতে পেরেছেন 'মাত্রাচেতনায়'। অন্তর্নিঃসহায়তাই কবির অনিবারণীয় ভবিতব্য নয়, নিজের বৃত্তাবর্তটিকে ভেঙে দিয়ে চাই শুভচেতনায় সংস্থিতি: 'আজকের দুর্দিনে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ কি, কি করে কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থ বোধ করতে পারা যায়, এসব বিষয় নিয়ে যে-কোনো প্রবীণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তার লিপিময় প্রকাশ মূল্যবান জিনিস'।[৪৩] সৎ কবি তাই 'ব্যক্তির নয়, কবির নিজের ব্যক্তিকতারও

নয়—সমস্ত দেশকাল সন্ততির পরিচয় হিসেবে' খোঁজেন 'আনুষঙ্গিক অনাস্থার অতীত বিশেষ আস্থা'।[৪৪] তার শব্দশিল্পে বেজে ওঠে 'শান্তিপর্ব ও সুসীম আস্তিক্যের সুর'।[৪৫] অমেয়তার অন্তঃকরণে ছড়িয়ে পড়তে চান' দিকে—দিগন্তরে। অনস্তিত্বের অভিমুখিতায় কবিতা আর তাই নির্জিত হতে পারে না, কেননা 'সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হলেও কবিতা ও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়েও যদি তাকে প্রয়োগপ্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো না কোনো এক রকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা দিতে না পারে তাহলে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না'।[৪৬] ভালো কবিতা পড়ে জীবনানন্দের ধারণায় 'সঙ্গতিসাধনের স্বস্তি লাভ' করা যায়।[৪৭] ধ্বংসের ভেতরেও চলে আনন্দ অভিযান:

> শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমনকি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে এবং নতুন করে গড়তে চাচ্ছে; এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনো একটা সুসীম আনন্দের দিকে।[৪৮]

এভাবেই জীবনানন্দ জীবনে ও কবিতায় 'মূল্যচেতনায়' স্থির হয়েছেন: 'তুমি কি করতে এসেছ অসীম দেশ ও অসীম কালের এক প্রান্তে? এর উত্তরে মন বলে, আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেছি যে 'দেখা হয়েছে' এই উত্তরটি সমস্ত কর্মের মধ্যে নিহিত, সমস্ত বাধার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে শুভ মুহূর্তে উদ্ভাসিত চৈতন্যের দীপ্তিতে এই উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সকল দেখার অন্তরে সত্যকে দেখতে পেলাম'।[৪৯] জীবনানন্দের এই

সত্যসন্ধান পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছিল তার বাবা ও মায়ের দৌত্যে, প্রতিপ্রান্তে দাঁড়িয়েও অনস্তিত্বের নিরসন ঘটেছিল অস্তিত্বের অভিজ্ঞানে।

কিন্তু বাংলা কবিতা যেভাবে লেখা হচ্ছিল সেই সময়, তাতে স্বস্তি ও শরণ কোনোটাই পান নি তিনি। গতিপ্রকৃতি বর্ণনা করে তাই এর চারিত্র কি হতে পারে সে সম্পর্কেও অন্তর্ভেদী আলোচনা করেছেন তিনি। এই প্রকল্পনার প্রাথমিক খসড়া পাই রবীন্দ্রকেন্দ্রিকতার ভূকেন্দ্র ছুঁয়ে নিষ্ক্রান্ত হবার অভিপ্রায় থেকে। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা'তে এই অনুভাবনার বিশদ উল্লেখ রয়েছে। জীবনানন্দ লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রোত্তর প্রকৃত আধুনিক কবিতার 'অভ্যুত্থান' সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে আর রবীন্দ্রপ্রয়াণের ১৫ বছর আগেই কল্লোলের সময়পর্বে পাওয়া যাচ্ছিল 'একটা প্রস্তুতির ইশারা'। রবীন্দ্রপরবর্তী সৃজ্যমান কবিতায় বাচনস্মরণীয়তা, অবান্তর চাতুরী হয়তো অপ্রাপণীয় নয়, কিন্তু কবিদের কেউ কেউ 'আরো দীর্ঘতর সময়ানুভূতির ভিতরে কবিতা সৃষ্টি করবার মুখপাত্র হিসেবে' রয়ে গিয়েছেন।

এই অপ্রতিম কবিদের উল্লেখেই আধুনিক বাংলা কবিতার পরস্পরবাহিত কিছু চারিত্রলক্ষণ শনাক্ত করেছেন জীবনানন্দ:

> বুদ্ধদেব বসু : 'দর্শনভীরু--তবুও তার কাব্যে জীবনদর্শন রয়ে গেছে'। 'মানুষ ও প্রকৃতির নিরন্তর পুরোনো উৎকর্ষ-পরিবর্তনের পথে অক্ষম বিজ্ঞানকে শুদ্ধতর শক্তির উৎস হতে দেখে--আরো শুভ্র হবে বিশ্বাস করে--শিল্পপ্রকরণ দিয়ে যতদূর সম্ভব হয় সহায়ক হিসেবে সেই উন্নতির পথে থাকতে অস্বীকৃত না হয়েও প্রাক্তন স্বপ্ন স্বাক্ষরিত হয়ে থাকতে ভালোবাসেন'।[৫০]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : 'আত্মপ্রসাদহীন সংযম দেশী–বিদেশী খুব কম লেখকের বেলাই দেখা যায়। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশী নিরাশা-করোজ্জ্বল চেতনা।[৫১] তাঁর কবিতা 'নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক'।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : 'সমুদ্রপ্রেমিক নাবিকের মতো--অতিবেল তরঙ্গের উপর দিয়ে ভূগোল ও মানুষের ইতিহাস ও অতিপৃথিবীর আকাশ চিনে, আধো চিনে, রৌদ্রপটবেলাভূমি সহসা লক্ষ্য করে আবার হারিয়ে ফেলে–এ জীবনকে সময়ের কাছে ঋণী রেখে, নিরন্তর সময় কাটিয়ে চলেছেন'।[৫২]

আধুনিক কবিদের রচনায় রয়েছে 'প্রকাশভঙ্গির আশ্চর্য মৌলিকতা'।[৫৩] এদের কবিতা সৃজনীসংরাগে কিট্‌স্, শেলি, ইয়েট্‌স, এলিয়ট, পাউণ্ড, লরেন্স প্রমুখের দ্বারা প্রভাবিত। তারা আরো ঋণী 'গত চার পাঁচশো বছরের ইউরোপীয় চিন্তা ও ভাববলয়ের কাছে'।[৫৪] তবু স্বীকরণসূত্রে ওই কবি এবং তাদের চিন্তনরাশিকে 'অম্লান স্বাস্থ্যে' হজম করে নিতে পেরেছেন বাঙালি কবিরা। আমাদের 'চেতনা ভাবনা শিল্পসত্য', এদেরই সংস্পর্শে উৎসারিত। জীবনানন্দ কারো একক গৌরবে নয়–যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ; বরং লক্ষ করেছেন এই নতুন কবিতা ও এর নন্দনগ্রন্থিটি বলয়িত হয়ে উঠেছে 'কবিসাধারণসংঘের' হাতে। ফলত আধুনিক কবিতা কারো একার্থমুখী একক সৃজন নয়, কয়েকটি ধারাসমাবেশ বা কয়েকজন কবির যুগ:

এ-যুগ বাংলাকাব্যের ইতিহাসে কয়েকটি ধারাসমাবেশের যুগ বলে--সাহিত্যে অনুস্তরণ নামে যে এক দীর্ঘ নদী আছে তার এক মহৎ

অববাহিকার মতো ছড়িয়ে থাকবে--যেখানে কোনো একজন রবীন্দ্রনাথ নেই, কিন্তু এমন কয়েকজন কবি আছেন যাঁরা সকলে মিলে একসঙ্গে উপস্থিত আছেন বলে কোনো দ্বিতীয় একক রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন নেই। এ যুগ অনেক লেখকের--একজনের নয় কয়েকজন কবির যুগ।[৫৫]

ধারাসমাবেশের ব্রতকল্প থেকে আধুনিক বাংলা কবিতা সৃষ্টি হলেও সংকল্পিত কবিতার কোনো মূল্য নেই, বলেছেন জীবনানন্দ। কেননা 'কোনো রকম সংকল্পে কবিতা উতরায় না, সংকল্পের সঙ্গে কবিতার কোনো সংশ্রব নেই। তবু কি লক্ষহীন কবির পরিক্রমা? না, 'মানবসমাজ', 'প্রকৃতি', 'সময়' এবং 'প্রাতিভাসিক কবিতাজগতের একাগ্রতা ভেঙে ফেলে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা দেয় সেই কবি ... মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে'।[৫৬] আর এভাবেই 'ঘটনা ও জীবনসমাবেশে' আসে 'আশ্চর্য নতুনত্ব' সাহিত্যের 'অর্থ ও লক্ষ' স্বতন্ত্রভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সমকালীন কবিতায়। ফলে নিহিলবাদ বা কেবলি শূন্যসন্ধান নয়: 'আজকের প্রচলিত—হয়তো শ্রদ্ধেয় মূল্যগুলোর বিনাশের পর কালকের আরো শুভ শুদ্ধতর মূল্যে উত্তীর্ণ হবার দিন আসবে—এ বিশ্বাস এখনকার নবীন কবিকে অর্জন করে নিতে হচ্ছে; না হলে একান্ত অন্তরাশ্রয়ী হয়ে পড়তে হয় তাঁকে; এর পরিণাম খুব ভালো হয় না'।[৫৭] কিন্তু শুধু ভবিষ্যতের শুভ শুদ্ধতর মূল্যজ্ঞানে অপেক্ষা করলে কবির লক্ষ নিষ্পন্ন হয় না, 'কালের জটিল বিন্যাস' আধুনিক কবির কাছে প্রাপণীয়। জগৎ এবং প্রাতিস্বিকতা—এই অবিমিশ্র অভিজ্ঞানেই কবিকে উত্তীর্ণ হতে হয়। আর এটাই হচ্ছে কবিতার 'ব্যক্তি ও উত্তরব্যক্তি সত্তাকে প্রকাশ করবার একটা দিক—মহৎ দিক'।[৫৮] কবিতা এভাবেই

'জনসাধারণের স্তরে' কবিকে পৌঁছিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে এসেছে—ভিড়ে গেছে তাদের ভিতরে'। বোঝা যায় তাঁর নিজের কাব্যচিন্তনে জীবনানন্দ তৈরি করে নিচ্ছেন জন-অধ্যুষিত একটা দৃষ্টিকোণ। এ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্টভাষ্য :

কবিতা রূপ পরিগ্রহ করে একটা অমেয় পরিধির ভিতর যেন—যাকে পাতালেও দেখা যায় এবং নীলিমায়, কিন্তু প্রধানত এই পৃথিবীর ভিতর, জনসমাজে।[৫৯]

'কেন লিখি'র জবাবদিহিতার মধ্যেও এই আত্মঅভিজ্ঞানটি হয়ে উঠেছে আরো নির্যাসনিবিড়: 'আমাদের এই গ্রহের জীবনসাক্ষ্যের সবচেয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ; কোনো বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অনুরূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন; তার কল্পনাপ্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিংবা নতুনভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এই সব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়'।[৬০]

তাহলে কবিতার কি কোনো দায় আছে? জীবনানন্দ আছে এবং নেই—এই দু'য়ের দোলাচল ভেঙে পরিশেষে সদর্থে উচ্চারণ করলেন: 'সৎ কবিতা খোলাখুলিভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা'।[৬১] আর 'শোষিত মানবজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের ও সেই বিপ্লবের শেষে আশা-ভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময়, দেশ, প্রকৃতি

ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিস হয়েও কেবলি শ্রুয়মান, ধ্যেয়মান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ; ও এই অভিজ্ঞতা—এই সুজাতার থেকেই উৎসারিত'। [৬২]

সবিশেষ লক্ষণীয় কবিতার 'নিজস্ব স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার' বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়েই একে মানুষ ও জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ। আর কবিতার এই স্বয়ংস্বাতন্ত্র্য চারিত্র থেকেই কবিতার অনির্বচ্য ভাষাচারিত্রের শিল্পায়তনিক কাঠামো নির্মাণ করতে চেয়েছেন তিনি।

রোলা বার্থ বলেছেন ফ্লবেয়ার থেকে শুরু আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে 'ভাষাসমস্যার' (problematics of language) সাহিত্য। জীবনানন্দও জানতেন কবিতা থেকে কবিতার পার্থক্য সূচিত হয় ভাষা ও রীতিতে; স্টাইল বা প্রকাশভঙ্গির আশ্চর্য মৌলিকতাই আধুনিক কবিতার চারিত্রলক্ষণ। কবিতার কারুকৃতির ওপর তাই গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি। বলেছেন, একে হতে হয় 'কাব্যশরীরী'।[৬৩] বোঝা যায় কোনো পারমার্থিক আরোপণ নয়, শরীরী—সংরাগে মুগ্ধ—সজীব কবিতা নির্মাণের কথা ভেবেছেন তিনি। কিন্তু কিভাবে কবিতা রচনা করবেন কবি, যাতে শারীরিকতা পেতে পারে এই সদুক্তি সমাচার? স্বয়ংক্রিয়তা ও চেতনার যুগ্মায়নেই কবিতা রচিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন রচনায় এরকম প্রজ্ঞাপন রয়েছে তাঁর; নির্বাচিত দু'টি অংশ:

> ১. কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই : যখনই 'ভারাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি--একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃ

প্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার; এর অনুশীলনের।... কিন্তু ভাবপ্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধতর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে; এ জিনিস ইতিহাস-চেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই। এই সব কারণেই-আমার পক্ষে অন্তত—ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো-কোনো সময় কাঠামোটি, এমনকি সম্পূর্ণ কবিতাটিও, খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে প্রায়। কিন্তু তারপর—প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে, কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায়: পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এরকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে। এর ফলে, আমার এক বন্ধু আমাকে লিখেছেন: 'কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস্য করে তোলে। এতে করে কোনো একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ন হয়, কিন্তু সমস্ত নক্‌শাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি'।[৬৪]

২. আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা 'প্রেরণা' শব্দটির দিকে আড়চোখে তাকাই। শব্দটির ঢের অপব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তবুও এর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির শুদ্ধতা ও সঙ্গতি নষ্ট হবার নয়। নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়— আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন— এবং সে সবের সম্মিলিত সম্বন্ধ— শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়। এ প্রেরণা অবিশ্যি মহাত্মা গান্ধী কিংবা লিঙ্কনের মতন রাষ্ট্রকর্মীর প্রেরণার চেয়ে পৃথক জিনিস— কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিকভাবে বুঝবার সুযোগ দেয় এই প্রেরণা।[৬৫]

প্রথম উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট যে ভারাক্রান্ত হবার পর অন্তঃপ্রেরণা, কল্পনাপ্রতিভা এবং অনুশীলনের অন্তর্বয়নে সৃষ্টি হয় কবিতা।

ফ্রয়েডের বিপরীতে দাঁড়িয়ে জাক লাকা তার সংগঠনবাদ (Structuralism)–স্পৃষ্ট অলব্ধপূর্ব ভাবনায় 'ভাষার মতো অবচেতনারও কাঠামো'[৬৬] আছে বলে যে প্রতিচিন্তনের ঘোষণা দিয়েছেন, এখানে যেন পাওয়া গেল তারই প্রযুক্তি। জীবনানন্দ নিজেই তার কবিতার টুকরো টুকরো অংশ কিভাবে একটা সুসমঞ্জস নক্‌শায় রূপান্তরিত হয় তার অনুমোদন দিয়েছেন প্রথম উদ্ধৃতিতে।

নব্য-মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের AURAতে লিরিক কবিতা নির্মাণের একটি সংকেতলেখ পাওয়া যায়--স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস ও প্রকৃতির যুগ্মতায় সৃষ্টি হয় কবিতা। বেঞ্জামিনের সংকেত-কাঠামো অনুসারে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে জীবনানন্দের কবিতা রচিত হয় ভারাক্রান্ততা, অন্তঃপ্রেরণা ও কল্পনা এবং ইতিহাস ও প্রতিবেশের সংশ্লেষে। কবিতা সৃজনের মুহূর্তে নানা উপকরণ এসে আবির্ভূত হতে পারে কবির মনে, কিন্তু কবি বেছে নেন 'ঠিক কয়েকটি উপকরণ'। [৬৭] জীবনানন্দ এরকম অনুসিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার অব্যবহিত পরেই জানিয়ে দেন এতটা সুনির্বাচিত নয় কবির মন। বরঞ্চ 'চেতনার লৌকিক স্বচ্ছতার চেয়ে' 'মন-নির্মনের সন্ধিতে' দাঁড়িয়ে 'উপরকণ'কে গ্রথিত করে কবিতা রচিত হয়। এ সম্পর্কে জীবনানন্দের বিস্তারিত ভাষ্য :

> যতদূর সম্ভব সব বিষয়েরই মানে ও লক্ষ্য বুঝতে চেষ্টা করেছে অনেকদিন মানুষ। প্রায় পুরোপুরি চেতনায় মানুষ অনেক সময় কথা ভাবে— কাজ করে। যেসব মুহূর্তে চেতনার এ দিককার অভিযান কম তখন আর এক রকম আলোর সন্ধান পাওয়া যায়, কেউ-কেউ বলে। মন-নির্মনের সন্ধি এই আলোর অপর রকম স্পষ্টতা দান করছে আমাদের— অনেক ধর্মসাধকদের এই মত। কোনো কোনো কবিও এই আলোয় স্থির স্পষ্টতার কাছে তাঁদের

কবিতার ঋণ স্বীকার করেছেন। চেতনার লৌকিক স্বচ্ছতার চেয়ে এ আলোক, তাঁরা মনে করেছেন, কবিতা সৃষ্টির উপকরণগুলোকে উদ্বোধন করতেও সাহায্য করেছে বেশি; তারপর গ্রথিত করা–সঠিকভাবে–এই উপকরণগুলোকে; তারপরে কবিতায় পরিণত করা। মানুষের সাংসারিক সজাগ মনের সম্পূর্ণ মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্ভব নয়। দরকারী উপাদানগুলো কবিতা নয়, কবিতা হবে সামাজিক তর্কবলে খানিকটা অবিশ্যি, কিন্তু যুক্তিতর্ক যেখানে সাময়িকভাবে অন্তত অন্তিম প্রসাদ লাভ করেছে এমনই একটা স্পষ্ট, অটুট মন–নির্মনের সহায়তায়।[৬৮]

ফলত, আধুনিক কবিতায় বিসারিত অন্তর্জ্ঞান এবং অবচেতনার গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন জীবনানন্দঃ 'আধুনিক কবিতা অন্তর্জ্ঞানের দুয়ার যথাসম্ভব খোলা রেখেছে; আগেকার যুগের কবিরাও স্বভাবতই অবচেতনার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়ে এসেছেন, কিন্তু সে পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার বোধ না থাকায় সেটাকে বড় একটা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নি; কিন্তু আজকাল এ উপায়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করা গেছে।[৬৯] আর বাংলা কবিতা এর দ্বারা বিভাবিত হয়েই মালার্মে–র‍্যাবো–রিল্‌কের কবিতাসোপান বেয়ে পৌঁছেছে 'প্রতীকযানে' (Symbolism)।

মালার্মে আমাদের জানিয়েছিলেন প্রতীকবাদের উদ্দীষ্ট হচ্ছে 'সত্তার পরিস্থিতিকে সঙ্কেতিত করবার জন্যই একটি বিষয়ের ক্রমিক অপাবরণ অথবা ঘুরিয়ে বলা যায় , একটি বিষয়কে চয়ন করে নিয়ে তার মধ্য থেকে সত্তার পরিস্থিতিকে পর্যায়ক্রমিক চিহ্নোদ্ধারের মধ্য দিয়ে সঞ্চালন করা'।[৭০] জীবনানন্দ এরই প্রেরণায় মন–নির্মনের সহায়তায় চেয়েছেন সৃষ্টি উপকরণের কিছুটা স্বয়ংক্রিয়, কিছুটা নির্বাচিত উদ্বোধন। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে রোমান জ্যাকবসনের কথা। জ্যাকবসন ভাষার যে দু'টি স্বাভাবিক প্রবণতার

কথা বলেছেন—সুনির্দিষ্ট কোনো অংশের সত্তাগত নির্বাচন (selection) এবং জটিল ভাষাগত খণ্ডের মধ্যে এর মিশ্রণ (combination)— জীবনানন্দের ভাবনাতেও দেখতে পাচ্ছি এরই সমান্তর প্রতিস্থাপন। এমনকি পরবর্তীকালে সুসান ল্যাঙ্গার কবিতার ভাষায় 'অনুভূতির যৌক্তিক অভিক্ষেপের' কথা বলে যে প্রাতিভাসিক ভাবকল্পময় (imagined) বিমূর্ততা (abstract) প্রত্যাশা করেছেন,[৭১] জীবনানন্দের ভাবনায় তার আগেই দেখা গেছে তারই স্পষ্ট ইশারা। শুদ্ধতর্কের ইঙ্গিত, ইতিহাসচেতনা, প্রতিবেশচেতনা, প্রতর্ক ইত্যাদি ঘুরে যে 'আবার ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে' কবিতা রচিত হয় জীবনানন্দের এই ভাবকল্পনার সঙ্গে ল্যাঙ্গারের যোগযুক্ততা খুঁজে পাওয়া তাই সহজ।

জীবনানন্দের গদ্যবিশ্বের এই হচ্ছে কবিতাচিন্তন—প্রবন্ধগুলির আভ্যন্তর অভিজ্ঞান, আন্তর-আত্মীয়তা যেমন স্পষ্ট, সহানুভবের সন্তাপে তেমনি তা প্রাণময়। আত্মভাবনা, বস্তুতথ্য, তার প্রতিভাস—উহ্য ও উচ্চারণের যুগ্মায়নে পূর্বাপর গ্রথিত; স্বোপলব্ধির পারস্পরিকতায় ওতপ্রোত হতে হতে গড়ে তুলেছে জীবনানন্দের ভাবনাবৃত্ত। ফলত তাঁর প্রবন্ধ-পাঠকদের এই সব গদ্য লেখার অনুকম্পন থেকে মুক্তি নেই একেবারেই। প্রাথমিকভাবে তাই কবিতাকে বুঝতে হলে, আধুনিকতাকে বুঝতে হলে, বিশেষত জীবনানন্দকে বুঝতে হলে—তাঁর গদ্যের কাছে আমাদের ঘুরেফিরে আসতেই হবে বারবার।

তথ্যনির্দেশ

১ জীবনানন্দ দাশ, কবিতার আলোচনা, *কবিতার কথা* (কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ১৩৭০, ২য় সংস্করণ), পৃ ৯২

২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯১-৯২

৩ *কবিতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯

৪ দ্রষ্টব্য Wordsworth and Coleridge, George Watson, *The Literary Critics* (Middlesex : Penguin Books) পুনর্মুদ্রণ ১৯৬৮, পৃ ১১৯

৫ Coleridge, *Biographia Literaria*, p 24.

৬ দ্রষ্টব্য Frank Kermode, *The Image*, *Romantic Image* (London : Ark/ Routledge & Kegan Paul, 1986), p 44

৭ জীবনানন্দ দাশ, *কেন লিখি*, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *জীবনানন্দ দাশ বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত* (কলকাতা: ভারত বুক এজেন্সি, ১৯৮৬) গ্রন্থে সংকলিত, পৃ ২২৪

৮ কবিতার আলোচনা, *কবিতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৩

৯ কবিতা পাঠ, *কবিতার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২

১০ জীবনানন্দ দাশ, 'আট বছর আগে একদিন' প্রসঙ্গে, *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র* (ঢাকা: দেশ, ১৯৯০, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত), পৃ ১২২

১১ *প্রাগুক্ত*, পৃ ১২২

১২ কবিতা ও কঙ্কাবতী, *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪

১৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৫

১৪ উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, *কবিতার কথা*, পৃ ৩২

১৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩২

১৬ উদ্ধৃত, Robert C. Solomon, The Anti-Transcendental Turn" Logic, Empiricism, and the the Rise of Relativism, The Rise and Fall of the Self (Oxford : Oxford University press, 1988), p 105

১৭ T. S Eliot, *Tradition and The Individual Talent, Selected Prose* (Middlesex: Penguin Books, rpt. 1963), p 23

১৮ Robert C. Solomon, *The Self Reinterpreted : Heidegger and Hermeneutics, The Rise and Fall of the Self*, p 164

১৯ George Watson–এর *The Literary Critics* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ১৪৪

২০ কবিতা পাঠ, *কবিতার কথা*, পৃ ৬০

২১ দেখুন Madan Sarup-এর *Post-Structuralism and Post-Modernism* (Hertfordshire : Harvester Wheatsheaf, 1988) গ্রন্থের *Foucault and the Social Sciences* প্রবন্ধটি, পৃ ৬৩

২২ মাত্রাচেতনা, *কবিতার কথা*, পৃ ২৯

২৩ কবিতার কথা, *কবিতার কথা*, পৃ ১২

২৪ মাত্রাচেতনা, *কবিতার কথা*, পৃ ২৯

২৫ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃ ২৩

২৬ *প্রাগুক্ত*

২৭ মাত্রাচেতনা, *কবিতার কথা*, পৃ ২৮

২৮ কবিতা পাঠ, *কবিতার কথা*, পৃ ৫৭

২৯ *প্রাগুক্ত*

৩০ কবিতার আলোচনা, *কবিতার কথা*, পৃ ৯৭

৩১ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আধুনিকতার সংজ্ঞা, *আধুনিক কবিতার ইতিহাস* (কলকাতা: ভারত বুক এজেন্সি, ১৯৮৩), পৃ ২

৩২ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃ ২১

৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ ২৫

৩৪ দেশকাল ও কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃ ৬৭

৩৫ ৬৬ হ্যারিসন রোড, কলকাতা থেকে লেখা, তারিখ ৩রা পৌষ ১৩৩৭। *জীবনানন্দ দাশ: বিকাশ-প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে সংকলিত, পৃ ৭৭

৩৬ অসমাপ্ত আলোচনা, *কবিতার কথা*, পৃ ১১৪

৩৭ কবিতা পাঠ, *কবিতার কথা*, পৃ ৬৩

৩৮ আধুনিক কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃষ্ঠা ১০৬

৩৯ James McFarlane, The Mind of Modernism, *Modernism* (Middlesex: penguin Books, ed. by Malcolm Bradbury and James McFarlane, rpt. 1983), P. 87

৪০ আধুনিক কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃ ১০৭

৪১ *Modernism* গ্রন্থের The Mind of Modernism প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ ৮৬

৪২ *Modernism* গ্রন্থের The Mind of Modernism প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য, পৃ ৮৭

৪৩ কেন লিখি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২৪

৪৪ সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃ ৮২

৪৫ কি হিসেবে শাশ্বত, *কবিতার কথা*, পৃ ৫৪

৪৬ রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃ ২৫-২৬

৪৭ কবিতা পাঠ, *কবিতার কথা*, পৃ ৫৮

৪৮ কবিতার কথা, *কবিতার কথা*, পৃ ১৫

৪৯ আমার মা বাবা, *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র*, পৃ ১০৮

৫০ উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, *কবিতার কথা*, পৃ ৩৬

৫১ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৬-৩৭

৫২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৭

৫৩ কবিতা ও কঙ্কাবতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৫

৫৪ কি হিসেবে শাশ্বত, *কবিতার কথা*, পৃ ৪৮

৫৫ উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, *কবিতার কথা*, পৃ ৩৮

৫৬ কবিতা প্রসঙ্গে, *কবিতার কথা*, পৃ ৪০

৫৭ কবিতা পাঠ : দুজন কবি, *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র*, পৃ ১১৭

৫৮ মাত্রাচেতনা, *কবিতার কথা*, পৃ ২৭

৫৯ *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩০

৬০ কেন লিখি, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২১–২২

৬১ *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২৪

৬২ *প্রাগুক্ত*, পৃ ২২৪–২৫

৬৩ 'আট বছর আগের একদিন' প্রসঙ্গে, *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র*, পৃ ১২৩

৬৪ কবিতা প্রসঙ্গে, *কবিতার কথা*, পৃ ৩৯–৪০

৬৫ কবিতার আত্মা ও শরীর, *কবিতার কথা*, পৃ ৪২

৬৬ দ্রষ্টব্য Richard Kearney-র *Modern Movements in European philosophy* (Manchester, Manchester University Press, 1986) গ্রন্থের Jacques Lacan প্রবন্ধটি।

৬৭ সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা, *কবিতার কথা*, পৃ ৭৭

৬৮ বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ, *কবিতার কথা*, পৃ ১০৮

৬৯ অসমাপ্ত আলোচনা, *কবিতার কথা*, পৃ ১১৪

৭০ দ্রষ্টব্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের *জীবনানন্দ* (কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ১৯৮৯), পৃ ৭১

৭১ Yevgeny Basin-এর *Semantic Philosophy of Art* (Moscow: Progress Publishers, 1979) গ্রন্থের The Phenomenological Theory of Art as a Virtual Symbol: Susan Langer প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য